চতুর্থ অধ্যায়

স্বাধীনোত্তর সময়ে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি

তথাকথিত ‘উত্তরবঙ্গ’ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হলেও নানাবিধ স্বাতন্ত্র্যে ভিন্নতর। বহু জনগোষ্ঠীর যেমন সমাবেশ এই উত্তরবঙ্গে তেমনি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও আলাদা। আচার সংস্কার থেকে লৌকিক দেবদেবী বিশ্বাসেও স্বতন্ত্র। ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক কারণে এই ভূ-খণ্ড বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে আলোড়িত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের স্বাতন্ত্র্য ব্রিটিশ শাসনকাল থেকেই নানাভাবে প্রশাসনিক প্রয়োজনেই স্বীকৃতি লাভ করে। সুদীর্ঘ ইতিহাসের সাক্ষী এই উত্তরবঙ্গ, বিশেষ করে প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলা। আবার মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাও কিছুটা স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও ভৌগোলিকতা নিয়ে বিরাজমান। এই জেলাগুলিতে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গাঙ্গেয় সভ্যতার প্রভাব সরাসরি পরিদৃশ্য হয় এবং যে অংশটি অনেক সময় মধ্যবঙ্গ বা গৌড়বঙ্গ হিসাবে পরিচিতি পায়। প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলা জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দার্জিলিং এবং নতুন জেলা আলিপুরদুয়ার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের চিহ্ন আজও বহন করছে। আবার ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তারের আগে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার অস্তিত্বই ছিল না। ব্রিটিশ সরকার তার সুবিধামতো ডুয়ার্সকে যেমন ব্যবহার করেছে তেমনি নিজেদের প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি মাথায় রেখে জেলা, বিভাগ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল আধিপত্য কায়েম এবং বাণিজ্য বিস্তার। তরাই ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ চা বাগানগুলি আজও তারই সাক্ষ্য বহন করছে। ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই তারা ক্ষমতার বিস্তার ঘটায় এবং সমাবেশ ঘটিয়েছে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষদের। এইভাবেই উত্তরবঙ্গের জনবৈচিত্র্য পাল্টে যায়। বস্তুত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নানা জাতি এবং জনজাতির স্রোত প্রবাহিত হয়েছে এই উত্তরবঙ্গে। জনজীবনে আর্য, দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, মঙ্গোলীয় বহু শাখার আগমন ঘটে, স্থায়ী হয় এবং বিস্তৃত অঞ্চল চিহ্নিত হয় নৃ-তত্ত্বের জাদুঘর হিসাবে। পরবর্তীকালে স্বাধীনোত্তর সময়ে বহু মানুষের আগমন ঘটে জীবন ও জীবিকার তাগিদে। দেশবিভাগ, দাঙ্গা ইত্যাদির কারণে বহু পূর্ববঙ্গীয়

মানুষের আগমন যেমন ঘটে তেমনি ভাগ্যান্বেষী বহু মানুষেরও আগমন ঘটে পার্শ্ববর্তী প্রদেশ ও দেশ থেকে। ফলত: আজকের উত্তরবঙ্গ অনিবার্যভাবে মিশ্র ভাষাভাষী ও মিশ্র সংস্কৃতির এক উর্বর অঞ্চল। লোক সাংস্কৃতিক চেতনায় বহু জনগোষ্ঠীর লোকায়ত চিহ্নের অভিব্যক্তি সহজেই চোখে পড়ে। জনবৈচিত্র্যের বহুবিধ চিহ্ন এবং বহু জনগোষ্ঠীর আদিম ও কৌম ছবির সন্ধান যেমন পাওয়া যায় তেমনি সমাজ বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ছবিও ধরা পড়ে। তার মধ্যে অন্যতম বৃহৎ এই রাজবংশী জনগোষ্ঠী বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীতে উপনীত হয়েছে এবং সাংস্কৃতিক বিবর্তনের অন্যতম পথিক হয়ে উঠেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজবংশী সমাজ নতুনভাবে আলোড়িত হয়। সমাজ ও সংস্কৃতির পরিসরটিও উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত হয়। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধে সহায়তার বিনিময়ে কোচ-রাজ্যকে (১৭৭৩ খ্রি:) করদমিত্র রাজ্যে পরিণত করে। রাজ্যের শাসন প্রণালী ও ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রেও তাদের নিজস্ব রীতিনীতির প্রচলন শুরু করে। প্রসঙ্গত ১৮৬৪-৬৫ খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয় ইঙ্গ-ভুটান যুদ্ধের তাৎপর্য ছিল সুদূর প্রসারী। এই যুদ্ধের ফলে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের মানচিত্র পাল্টে যায় ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। বিস্তীর্ণ ডুয়ার্স এলাকাকে তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে চা-বাগিচার পত্তন শুরু করে এবং প্রশাসনিক স্বার্থে জলপাইগুড়ি জেলা (১৮৬৯ খ্রি:) গঠন করে। দার্জিলিং তথা কালিম্পং, ডালিমকোট সহ তরাই অঞ্চলকেও তারা নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে আজকের উত্তরবঙ্গের অবয়ব এই সময়েই গঠিত হয়। স্বাভাবিকভাবে এই সময়েই তারা সুবিধে মতো প্রশাসনিক সংস্কারের কাজটিতেও হাত দেয়। এই সময়েই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জাতিতত্ত্ব নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের প্রশাসনিক আধিকারিক, গবেষক, নৃ-তত্ত্ববিদদের বিভিন্ন মতামত রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মানুষদের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। হ্যামিলটন বুকাননের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পরিসংখ্যানের (১৮০৭-১৮১৭ খ্রি:) উপর ভিত্তি করে মন্টেগোমারী মার্টিন, ই. টি. ডালটন, জেমস ওয়াইস, ডব্লিউ. ডব্লিউ হান্টার, এইচ, এইচ. রিজলে, বি. এইচ. হজসন প্রমুখরা যখন বলেন যে নৃতত্ত্বের বিচারে কোচ, পলিয়া, রাজবংশী মূলত একই উপজাতীয় গোষ্ঠীর মানুষ।[১] ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারি প্রতিবেদন পর্যালোচনায় ডব্লিউ. ডব্লিউ হান্টারও বলেন যে “আদমসুমারি প্রতিবেদনে অর্ধ-হিন্দু আদিবাসী হিসাবে উল্লিখিত কোচ, পালিয়া ও রাজবংশী জনগোষ্ঠীর লোকজন যারা কুচবিহার

রাজ্যেও রাজ্য সংলগ্ন আদিবাসী, তারা মূলত: একই বংশোদ্ভূত উপজাতি।[২] ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের লোক গণনার প্রাক্কালে জাতির ঘরে 'কোচ' লেখার সরকারি নির্দেশ জারি হলে বিতর্ক আরও দানা বাঁধে। এই বছরই শ্যামপুকুরের জমিদার হরিমোহন রায় খাজাঞ্চির নেতৃত্বে গঠিত হয় 'রংপুর ব্রাত্য ক্ষত্রিয় জাতির উন্নতি বিধায়নী সভা'। এই সভার মাধ্যমে রংপুরের প্রভাবশালী জমিদার ও মোক্তাররা এই আদেশের বিরোধিতা করেন। এবং জাতির ঘরে 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয়' লেখার দাবি জানাতে থাকেন। কিন্তু ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের লোকগণনা এবং ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের লোকগণনাতেও 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয়' উল্লেখ না হওয়ায় আন্দোলন তীব্রতর হয়। এটা ইতিহাসগত সত্য যে রাজবংশী সম্প্রদায় সামাজিকভাবে সংগঠিত হওয়ার সূচনা হয় ঔপনিবেশিক সময়কালে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে। বস্তুতপক্ষে, সে সময় থেকেই তাঁদের মধ্যে ভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীগত সত্তা প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। তাঁদের এই সামাজিক (Social mobility) গতিশীলতা আন্দোলনের প্রক্রিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে উপস্থিত হয়েছিল ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে রংপুর নাট্য মন্দিরে আয়োজিত এক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে।[৩] যার ফলশ্রুতি ক্ষত্রিয় সমিতির আবির্ভাব। সম্মেলনে উপস্থিত হন রংপুর সহ জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দিনাজপুর, ধুবরী, বগুরা, ময়মনসিংহের প্রায় ৪০০ জন প্রতিনিধি। সম্মেলনে ক্ষত্রিয় সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্যবিধি ঘোষণা করেন সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে মধুসূদন রায় ও পঞ্চানন সরকার।[৪] এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনায় আধিকারিকের নিকট 'রাজবংশী' জাতিকে ক্ষত্রিয় সমাজ ভুক্তির দাবি পেশ করা এবং রাজবংশী ও কোচকে পৃথক পৃথকভাবে নথিভুক্ত করে রাজবংশীকে ক্ষত্রিয় হিসাবে গণনার দাবি জানানো। ইতিমধ্যে রংপুর ক্ষত্রিয় সমিতি নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা প্রস্তুত একটি ব্যবস্থাপত্রে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় স্বীকার করে স্বীকৃতি পত্রও লাভ করে।[৫] রংপুর ক্ষত্রিয় সমিতির লক্ষ্য হল ১) রাজবংশী ও কোচরা পৃথক জাতি এবং কোচরা রাজবংশী ক্ষত্রিয়দের চেয়ে নিকৃষ্ট তা প্রচার করা এবং রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী বৈধ প্রমাণ করা ২) রাজবংশীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ সুলভ আচরণের (Sanskritisation) বিকাশ ঘটানো। সাধারণ রাজবংশীদের ঐক্যবদ্ধ করতে এবং তাদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি বৈধকরণ করতে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের সংস্কার সুলভ আন্দোলনের (Sanskritisation) পদক্ষেপ নেয় রংপুর ক্ষত্রিয় সমিতি। এই আন্দোলনের পরিস্থিতিতে ক্ষত্রিয়

সমিতির কর্ণধার হিসাবে উঠে আসেন মাথাভাঙ্গা কোচবিহারের খলিসামারীর সন্তান পঞ্চানন বর্মা (সরকার)। তিনি রাজবংশী হিন্দুদের মধ্যে প্রথম উচ্চশিক্ষিত (এম. এ এবং বি. এল) ব্যক্তি। কোচবিহারে জন্মগ্রহণ করলেও আইন ব্যবসার সূত্রে এই মহান ব্যক্তিত্ব রংপুর শহরে বসবাস শুরু করেন।[৬] তিনি দীর্ঘ ক্ষাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে বিভিন্ন শাস্ত্র ঘেঁটে একথা প্রমাণ করতে সমর্থ হন যে রাজবংশীরা ম্লেচ্ছ নয়, বরং এরা ব্রাত্য ক্ষত্রিয় (ক্ষত্রিয়চ্যুত)[৭] অবশেষে আন্দোলন এবং নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা প্রাপ্ত ব্যবস্থাপত্রের উপর ভিত্তি করে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের লোকগণনার আলোকে রাজবংশী ক্ষত্রিয় হিসাবে উল্লেখ করা হয় যদিও রাজবংশীদের 'ক্ষত্রিয়' হিসাবে চিহ্নিত করা হয় না।[৮] রাজবংশী পৃথক ক্ষত্রিয় হিসাবে পরিচয় লাভের জন্য ক্ষত্রিয় সমিতি ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ও ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারি চলাকালে আন্দোলন আরও তীব্র করে তোলে।[৯] মনীষী পঞ্চানন বর্মা বরাবরই রাজবংশী ও কোচদের পৃথক জাতিগোষ্ঠী বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি রাজবংশীদের কোচ জনগোষ্ঠী থেকে Superior Caste বলে মনে করতেন। তাঁর দীর্ঘ আন্দোলন ও প্রচেষ্টায় অবশেষে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারিতে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় বলে উল্লেখ করা হয়।[১০] পরবর্তীকালে তার মন্ত্রশিষ্য উপেন্দ্রনাথ বর্মন তার 'রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস' শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন "The Rajbanshis were Kshatriya and lived in the land called 'Poundra Desh' between the river Karotoya and Ganga." আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য 'বিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্ন থেকে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের মধ্যে বিশেষ করে রংপুরে অত্যন্ত ক্ষীণাকারে একটি জমিভিত্তিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির সূত্রপাত হয়।'[১১] তারাই ছিলেন ক্ষত্রিয় সমিতির ব্যক্তিবর্গ। তাদের মাধ্যমেই প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে রাজবংশী সম্প্রদায় 'রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতির মাধ্যমে' তত্ত্বগত ভাবে (Theoretically) বা বাস্তবে (Practically) বঙ্গের অন্যান্য বিশেষ করে উচ্চবর্ণ বাঙালি হিন্দু জাতি থেকে সরাসরি বিভাজিত এবং স্বজাত্যের আত্মপরিচয় ও আত্ম উন্মোচনের জন্য সংঘবদ্ধ হয়। ১৯০১ সালে বাংলার গভর্ণর রাজবংশীদের কোচদের সঙ্গে একত্রিত করে গণনা করেই এই অভিমানকে আঘাত করেন। বলা যায় এই সময়েই রাজবংশীদের ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ঐতিহ্য উদ্ধারের সূত্রপাত ঘটে এবং পরবর্তী ধাপে 'রংপুর ক্ষত্রিয় সমিতি' গঠন (১৯১০ খ্রি:) এবং ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ২৭ মাঘ (১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি) উপনয়ন গ্রহণের সংস্কার এই ব্রাত্যত্ব মোচনের

একটি প্রয়াস এবং এই দিনটিকে পবিত্র দিবস হিসাবে উদ্‌যাপন রাজবংশী সংস্কৃতির একটি অবশ্য কর্তব্য হয়ে ওঠে। রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মা স্বাধীনতার পূর্বসময়গুলিতে রাজবংশী জাতিকে সংঘবদ্ধ শুধু নয় আত্মপরিচয়ে বলীয়ান এবং দশমবিধ সংস্কার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আত্মশুদ্ধি ও জাতির উন্নয়নের জন্য সম্পূর্ণ জীবন উৎসর্গ করেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পরবর্তী সময়কালে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন। কারণ তিনি উপলব্ধি করেন শুধুমাত্র রাজবংশীদের সামাজিক পরিচিতির দিক থেকে ক্ষত্রিয় হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করলেই হবে না যথার্থ পরিচয় লাভের জন্য অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত অগ্রগতি দরকার। তার জন্য তিনি রাজবংশী জাতিকে তপশীলভুক্ত জাতি হিসাবে স্বীকৃতি লাভের জন্য দাবি জানাতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। বলা যেতে পারে একমাত্র তারই প্রচেষ্টায় ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে তপশিলী জাতির তালিকা প্রকাশিত হলে রাজবংশীরা এই তালিকাভুক্ত হয়।[১২] স্বাধীনতার পর ভারতীয় সংবিধানের ৩৪১ নং ধারায় এবং ১৯৫০ ও ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের আদেশনামায় রাজবংশীরা পশ্চিমবাংলায় ‘Scheduled Caste’ তালিকায় থেকে যায়।[১৩]

দীর্ঘ ক্ষত্রিয় আন্দোলন ও পঞ্চানন বর্মার নেতৃত্বে রাজবংশী সমাজ সংগঠিত হয়। সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও কিছু সংস্কার এবং রীতি প্রচলিত হয় রাজবংশী সমাজে। স্বাধীনোত্তর সময়ে সেই ধারায় এই সমাজ ও সংস্কৃতির পরিসর ব্যাপ্তি লাভ করে। বিংশ শতাব্দীর আটের দশক অবধি বলা যায় সেই ধারা অব্যাহত থাকে। তার পরবর্তী সময়ে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি সংকটাপন্ন হয়। গ্রাম সমাজের পরিবর্তন, অর্থনৈতিক কাঠামোর দুর্বলতা সরাসরি রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতিকে আঘাত করে। ইতিমধ্যে রাজবংশী সমাজের মধ্যেও নব্য মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে ওঠে। শহরে বসবাসকারী চাকুরে বুদ্ধিজীবী, অবস্থাপন্ন কিছু মানুষ বৃহত্তর সমাজ সংস্কৃতির ঘেরাটোপে আবদ্ধ হয়। গ্রাম ও শহুরে জীবনের মধ্যে ব্যবধান রচিত হয়। গ্রামগুলি তখন মিশ্র সংস্কৃতির আবর্তে বিভ্রান্ত এবং বিশ্বায়নের স্রোতেও ধাবমান। সব মিলিয়ে একটা পরিবর্তনের স্রোত সামগ্রিক ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। রাজবংশী সমাজের মধ্যেও তখন বিভিন্ন বিষয়, ভাবনা, আন্দোলন, সংঘবদ্ধতা, দাবী দাওয়ার বিষয়গুলি উত্থাপিত হয়। ফলত: এক অস্থির অবস্থার সৃষ্টি হয়। আবার এইসবের মধ্যে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি, আত্মানুসন্ধান এবং সচেতনতা বৃদ্ধির একটা প্রয়াস দেখা যায়। মনীষী পঞ্চানন বর্মার নেতৃত্বে রাজবংশী সমাজ প্রথমবার সংগঠিত হওয়ার পর সমাজ সংস্কৃতি নিয়ে পর্যালোচনার একটি পরিসর তৈরি হয় এই পর্যায়ে।

ক্ষত্রিয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজবংশী জনগোষ্ঠী মানুষ যেমন দাস, সরকার পদবি পরিত্যাগ করে বর্মা, রায়, বর্মন, পদবি গ্রহণ করে। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় সিংহ, সরকার, দেবশর্মা পদবি গ্রহণের প্রবণতা দেখা যায়। ক্ষাত্র পরিচয়ের জন্য উপবীত ধারণ ও পদবির মধ্য দিয়ে সংস্কার বিধির নানা প্রক্রিয়া চালু হয়। ‘অশুচ’ (অশৌচ) পালন ৩০ দিনের পরিবর্তে ১২ দিনে শেষ করা, ধর্মীয় পূজা অর্চনা গায়ত্রী মন্ত্রোচ্চারণ, সন্ধ্যা পূজা, গীতা পাঠ প্রভৃতি নিয়মাবলীর সূচনা ঘটে। ধর্মীয় সংস্কারের অঙ্গ হিসাবে শক্তির প্রতীক চণ্ডী পূজার প্রচলন হয়। উত্তরবঙ্গের সর্বত্র এই সংস্কার বিধি প্রচলিত না হলেও কোচবিহার, জলপাইগুড়ি উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয়। তরাই-ডুয়ার্স এলাকায় পঞ্চানন বর্মার ক্ষত্রিয়করণের প্রভাব পড়তে একটু সময় লাগে। স্বাধীনতার পরেও এক-দুই দশক অবধি এরা পদবি পরিবর্তন কিংবা উপবীত ধারণের বাইরেই থাকে। যার জন্য আজও দাস পদবি রাজবংশী সমাজে দেখা যায়। বর্তমান আলিপুরদুয়ার জেলার ভাটিবাড়ী, কুমারগ্রাম থানা, তপসীখাতা এলাকায় দাস পদবিধারী রাজবংশীরা যেমন আছেন তেমনি দার্জিলিং জেলার নেপাল সংলগ্ন নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া এলাকায় সিং পদবিধারী রাজবংশীদের বসবাস। দুই দিনাজপুর এলাকাতেও সিংহ পদবিধারী রাজবংশী পরিবারের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়েও ক্ষত্রিয়ত্বের ভাবনায় বিশ্বাসী হয়েও পদবির ক্ষেত্রে তারা পূর্ব ধারাই বজায় রেখেছেন। আবার মালদহ ও দিনাজপুর জেলায় অনেক রাজবংশী পরিবার আজও পলিয়া বা পালিয়া নামেই পরিচিত। কোচবিহার জেলায় বেশকিছু রাজবংশী মানুষ ‘সরকার’, ‘সেন’ পদবি গ্রহণ করেছেন। খেন বংশীয় হিসাবে তারা আখ্যায়িত। এটা বলা যায় বিভিন্ন পদবি থাকা সত্ত্বেও ‘ক্ষত্রিয়’ রাজবংশীরা এই পরিচয় দীর্ঘ আন্দোলনে রাজবংশী সমাজ লাভ করেছে। আবার সব রাজবংশী মানুষই কাশ্যপ গোত্রের এবং একই গোত্রে বিয়ে সিদ্ধ। রাজবংশী সমাজে গোত্র বিভাগ না থাকলেও গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা বর্তমান। এক এক গ্রামে কয়েকটি গোষ্ঠীর লোক বসবাস করেন। এই গোষ্ঠী বিচারেই বিয়ে সম্পন্ন হত। সাত-আট দশক অবধি এই ছবিটি ছিল স্বাভাবিক। বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণে দূরবর্তী এলাকাতেও বিয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে। বস্তুতঃ রাজবংশী সমাজ একটি সমগোত্রীয় জনসমষ্টি। তাদের মধ্যে একটিমাত্র গোত্র, সেটা হল কাশ্যপ গোত্র এবং তারা সমগোত্রের মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতেন।[১৪] পরিবার ভিত্তিক সমাজ, পিতৃতান্ত্রিক এবং

যৌথ পরিবার ভিত্তিক গ্রাম সমাজ। গ্রাম সমাজে বয়োজ্যেষ্ঠদেরই বিশেষ গুরুত্ব। তাদের মতামত ও সম্মীলনে সমাজ সংস্কৃতি আবর্তিত হত। আত্মীয় পরিজন, বৃহৎ জোতদার পরিবার, আধিয়ার সবাই মিলে পাশাপাশি অবস্থান করতেন। আর যেহেতু সবাই কৃষিজীবী ফলত: বিশেষ শ্রেণিভেদ ছিল না। প্রত্যেকটি মানুষ গ্রাম সমাজের আবদ্ধ থাকত নানারকম সামাজিক কিংবা আত্মীয়তার বন্ধনে। কৃষিকার্যে নারীরাও সমানভাবে অংশ নিতেন। পর্দাপ্রথার কঠোরতা ছিল না। তাই রাজবংশী মহিলাগণ সমাজের অন্যান্য মহিলাদের তুলনায় অধিক স্বাধীনতা ভোগ করতেন। স্বাধীনোত্তর সময়েও কৃষিকাজের বাইরে রাজবংশী সমাজের আগ্রহ বিশেষ ছিল না। এমনকী শিক্ষার বিষয়েও। এই ছবিটা সাতের দশক অবধি অব্যাহত ছিল। পরবর্তীকালে এই ভাবনার পরিবর্তন ঘটে। এমনকী ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা অন্যান্য সেক্টরেও রাজবংশী সমাজের উদাসীনতা লক্ষ করার মত বিষয় গুলি আর্থসামাজিক পরিসংখ্যানে উঠে আসে। রাজবংশী লোকেরা সহজ, সরল, পরিশ্রমী এবং সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল। বাড়তি কোন চাপ কিংবা ভবিষ্যতের কথা না ভেবেই নিশ্চিন্তে বিলাস ব্যসন, ন্যূনতম চাহিদা, গান বাজনায় দিন কাটানোর ছবি পাঁচ-ছয়ের দশকেও অব্যাহত ছিল।

রাজবংশীদের বিবাহ প্রথা ও অভ্যাসের মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ ছিল। পেশাদারী অপেশাদারী ভাটাইত, কারোয়া (ঘটক) নামক ব্যক্তির মাধ্যমেই বিবাহের সম্পর্ক স্থাপিত হত। কামরূপী ব্রাহ্মণ দ্বারাই বিবাহ কার্য সম্পন্ন হত।[১৫] নিয়মিত ও অনিয়মিত দু'ধরনের বিবাহের প্রচলন ছিল। নিয়মিত বিবাহের মধ্যে 'ফুল বিয়া' যেখানে একজন ছেলে ঋতুমতী মেয়েকে বিবাহ করেন। এ ধরনের বিবাহে পাত্র ও পাত্রী উভয়কেই মুকুট (শোলার) পরানো হয়।[১৬] এখানে একজন ব্রাহ্মণ বা অধিকারী অতি আবশ্যক। নিয়মিত বিবাহের মধ্যে 'ঘর জেয়া বিহা' (Ghor-dzia biha) অন্যতম। পাঁচের দশকেও তা প্রচলিত ছিল। এই ধরনের বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র তার প্রস্তাবিত শ্বশুরবাড়িতে জামাই হিসাবে থাকত এবং সংসারের যাবতীয় কার্যে সহায়তা করত। বিশেষ করে কৃষিকার্যে। এর নিহিতে লুকিয়ে আছে কন্যাপণের প্রথা। আগে পাত্রীর বাবাকে কন্যাপণ দিয়ে বিয়ে করতে হত। পাঁচের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত রাজবংশী সমাজে এই রীতি প্রচলিত ছিল। বিধিসম্মত নয় অর্থাৎ অনিয়মিত বিবাহের মধ্যে ছিল পানিছিটা, ছত্রদানি, লিভারেট বিবাহ (নিঃসন্তান ভাতৃজায়াকে বিবাহ), ঘর সোন্দানি, ডাংগুয়ানি, পরক্ষেত্রি, পাছুয়া,

গাওগছ এবং কইনাপাত্র। রাজবংশী সমাজে বিধবা বিবাহ বহুপূর্ব থেকেই প্রচলিত। পানিছিটা বাপ-মাও, মিস্তর ধরা রীতি সংস্কারের অঙ্গ। বৈরাতী বিয়ের যাবতীয় নিয়মরীতি অনুসরণ করার কাজটি করত। বউভাতে গ্রামের বয়স্কদের বিশেষ সম্মান দিয়ে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা থাকে। আটের দশক পর্যন্ত নিয়মরীতির রক্ষণশীলতা থাকলেও ধীরে ধীরে তা হ্রাস পায়। একজন মহিলা তার পূর্ব স্বামী জীবিত থাকা সত্ত্বেও যখন অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন সেই বিবাহ ছত্রদানী বিবাহ হিসাবে আখ্যায়িত হয়। কোন পুরুষের বাড়িতে কোন মহিলা স্ত্রী অধিকার নিয়ে হাজির হয়ে বাড়ির কাজকর্ম করতে থাকলে কয়েকদিন পরে সে মহিলাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে সমাজকে 'ঘর সোন্দানি' বিবাহ সম্পন্ন করে। এক্ষেত্রে মহিলাটি 'পাছুয়া' এবং পুরুষটি 'সাংনা' নামে পরিচিতি পায়। আবার কোন পুরুষ যদি কোন বিধবা মহিলাকে স্ত্রী মর্যাদা দিয়ে বাড়িতে রাখেন তখন বলা হয় 'গাও গছ'। আবার উল্টে যদি কোন সম্পদশালী মহিলা কোন পুরুষকে তার কাছে থাকতে দেন এবং বাড়ির কাজকর্ম করান সেই সম্পর্ক বিবাহকে বলা হয় 'ডাংগুয়া'। এক্ষেত্রে সামাজিক স্বীকৃতির পরেই সন্তান-সন্ততিরা সম্পত্তির অধিকারী হন। আবার যখন কোন বিধবা মহিলার কোন অভিভাবক থাকে না তখন কোন পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক করে তার বাড়িতে চলে যায়, তখন সেই মহিলা 'পরক্ষেত্রি পাচুয়া' নামে পরিচিতি পায়। এই সমস্ত ধরনের বিবাহকেও সমাজ একপ্রকার রীতি সংস্কারে স্বীকৃতি দিত। এই শিথিলতা ছিল রাজবংশী সমাজে। একাধিক বিয়েরও প্রচলন ঘটে এই ধরনের অনিয়মিত বিবাহের মধ্য দিয়ে। যদিও এক বিবাহই রাজবংশী সমাজে স্বীকৃত। তথাপি সম্ভ্রান্ত রাজবংশী পরিবারে প্রথাগত ও প্রথা বহির্ভূত স্ত্রীর উদাহরণ স্বাধীনতার সময়কালেও দেখা গেছে। সামাজিক ব্যাভিচারের বিষয়টিকে প্রতিরোধ করার একটি প্রয়াস ছিল বলা যায়। তবে স্বাধীনতার কয়েক দশকের মধ্যে এই বিবাহগুলির প্রচলন কমে যায়। বিবাহ বিচ্ছেদ রাজবংশী সমাজে প্রচলিত ছিল তবে এক্ষেত্রে কোন ক্ষতিপূরণের রেওয়াজ ছিল না।[১৭] উল্লেখ্য রাজবংশী সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের মত ঘটনা সংখ্যায় নগণ্য।[১৮] বাল্যবিবাহ রাজবংশী সমাজে এক পুরনো ঐতিহ্য। সাতের দশক অবধি এটা দেখা যেত। কিন্তু স্বাধীনোত্তর সময়ে রাজবংশী সমাজ বর্ণহিন্দুদের সংস্পর্শে আসায় মহিলাদের অধিকার, আইন, সমাজচেতনা ও সামাজিক কর্তব্য ভাবনায় অনেক কিছুই বর্জন করে। 'কন্যাপণে'র পরিবর্তে চালু হয় 'বর পণ', অপেক্ষাকৃত সাবালক অবস্থায়

বিবাহ, নিয়ম সংস্কারেও শিথিলতা আসে।

রাজবংশী সমাজ জীবন সংস্কৃতি নির্ভর এবং লৌকিক ধর্মকেন্দ্রিক ছিল। স্বাধীনোত্তর সময়কালে সে ছবিটি অক্ষতই ছিল। আটের দশকের শেষদিকে সমাজ সংস্কৃতির সংকট ঘনীভূত হয় আর্থসামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে। পূজা-পার্বণকেন্দ্রিক সংস্কৃতি আবার কৃষিকে ঘিরেও সংস্কৃতির পরিমণ্ডলটি ছিল বিস্তৃত। তবে এটা বলা যায় বর্ণ-হিন্দুদের অনেকাংশে প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও লৌকিক পরিসরটি কোনভাবে বর্জিত হয়নি। আজও সেটা দৃশ্যমান হয়, অবশ্য আয়োজন কিংবা নিয়মনীতির ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটেছে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের পূজাচ্চর্নায় একদিকে যেমন পরিলক্ষিত হয় গোষ্ঠী জীবনাচারণের পূর্বপুরুষ, দেবতার পূজার্চ্চনা অন্যদিকে লক্ষ্য করা যায় আর্থসামাজিক অবস্থান থেকে উঠে আসা রাজা, জোতদার, তহশীলদার, (কোষাধ্যক্ষ) দেওয়ান অবধি। তেমনি নদী জলাশয়ও দেবতা হিসাবে স্থান পেয়েছে বাড়ির ঠাকুর পাটে। শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মেরও অন্তর্ভূক্তি ঘটেছে। শক্তির দেবী হিসাবে কালীও বহুপ্রকারে স্থান পেয়েছে। মাশান (কোচবিহার জেলার অন্যতম লৌকিক দেবতা), বুড়াঠাকুর, মহাকাল, বিষহরি যেমন অন্যতম হিসাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে তেমনি গাবুর ঠাকুর, গারাম ঠাকুর, ডাংধরা, সন্ন্যাসী, রাখাল এমনকী পীর দেবতাও স্থান পায় অনায়াসে। সেইসঙ্গে প্রাকৃতিক দেবতা হিসাবে হুদুম দ্যাও, তিস্তাবুড়িও পূজিত হয়। সবার বাড়িতে ঠাকুরের পাটে ছোট ছোট ঘরে ঠাকুরের আসনে মাটির ঢিপি কিংবা পাথরই প্রতীকী হিসাবে দেখা যায়। সাতের দশকের আগে মূর্তির বিশেষ প্রচলন ছিল না। মন্দিরে পাশে থাকত সাদা, লাল কাপড়ের নিশান এবং চাঁদোয়া। এই সমস্ত দেবতার অবস্থান স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়। আজও সেই দেবতাগুলির পাট দেখা গেলেও পূজার্চ্চনায় সংক্ষিপ্ততা এসেছে। মানত, উৎসর্গ রাজবংশী সমাজের অন্যতম অনুষঙ্গ। হাঁস, পায়রা, পাঠা উৎসর্গ বেশিরভাগ দেবতার ক্ষেত্রেই দেখা যায়। সহজলভ্য লৌকিক উপাচার দুধ, দই, চিড়ে, কলা, (বীজযুক্ত আটিয়া কলা) ব্যবহারও রাজবংশী সমাজে প্রচলিত। রাজবংশী সমাজের অধিকারী, দেওসী, দেওধারাই পুরোহিতের কাজ করেন। অনেকক্ষেত্রে বাড়ির বয়স্ক পুরুষরাই পূজার কাজ সম্পন্ন করেন। এই ব্যাপারে বিশেষ বাধানিষেধ নেই। স্বাধীনোত্তর সময়ের পরও কিছুকাল এই ছবিটাই ছিল স্বাভাবিক এবং বাড়ি বাড়ি পূজার্চ্চনার একটি পরিসর ছিল, বর্তমানে থাকলেও পরিস্থিতি বদলেছে আর্থ সামাজিক অবস্থার দুর্বলতা এবং পার্শ্ববর্তী সমাজ

সংস্কৃতির আগ্রাসনে। আবার দোল সওয়ারী, চৈত্র সংক্রান্তিকে ঘিরে বিষুয়া, গমীরা ঠাকুরের মাগন ও পূজা, গোরখনাথের মাগনে রাখাল বালকদের উন্মাদনা কয়েক দশক আগেও ছিল। বর্তমানে খুব অল্প কিছু জায়গায় সম্পন্ন হয়। হুদুম দ্যাওর মাগন ও পূজা প্রায় উঠে যাবার মতই। তিস্তাবুড়ির পূজাকে ঘিরে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকে কিংবা কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ ব্লকে বহুল প্রচলিত, বৈশাখ মাস জুড়ে বিভিন্ন দলকে পথে প্রান্তরে দেখা যায়। অনেক লৌকিক দেবদেবীর সংখ্যাও কিন্তু কয়েক দশকে কমে গেছে। বর্ণ হিন্দুদের সংশ্রব আর্থসামাজিক কাঠামো পরিবর্তন সর্বোপরি বিশ্বাস ভাবনার পরিবর্তনে শূন্য দশকে অনেক দেবদেবী লোকান্তরিত হয়। সেইসঙ্গে প্রজন্মগত বিচ্ছিন্নতাও অনেকাংশে দায়ী। উল্লেখ্য রাজবংশী সম্প্রদায় সুদীর্ঘকাল বিভিন্ন জনজাতির সঙ্গে পাশাপাশি বসবাস এবং বর্ণহিন্দুদের ধর্ম সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও পুরোপুরিভাবে হিন্দুধর্মের যাবতীয় সংস্কার গ্রহণ করেননি বরং অতীতকালের ধর্মীয় বিশ্বাস যেমন — পূজা উপলক্ষে গ্রামে মাঙ্গলিক থানে পশুবলি, নদনদীকে দেবতাজ্ঞানে পূজার্চ্চনা, বড় বৃক্ষকে দেবতাজ্ঞানে তেল সিঁদুর মাখিয়ে প্রণাম ও প্রার্থনা জানানো প্রভৃতি ত্যাগ করেনি। রাজবংশী জীবনে মঙ্গলবোধ, শ্রেয়োবোধ অতীত ধর্মবিশ্বাসে তাদের মধ্যে সদা জাগ্রত।[১৯] সেটা স্বাধীনোত্তর সময়ের কয়েক দশকেও ক্ষুণ্ণ হয়নি। রাজবংশীদের আরাধ্যদেবতা মহাদেব, কালী ও মনসা দেবী। সামাজিক মঙ্গলসাধন, ফসল বৃদ্ধিকেন্দ্রিক বেশ কিছু লৌকিক পূজা উত্তরবঙ্গের ও অন্যান্য এলাকার রাজবংশী সমাজ করে থাকেন। রাজবংশী সমাজে কৃষিকেন্দ্রিক যে সমস্ত পূজা উৎসব প্রচলিত আছে সেগুলি হল — তিস্তাবুড়ি, গছিবোনা, ডাক-লক্ষ্মী, বুড়াবুড়ি, বৈশাখী, আষাঢ়ী, সেবা, আমাতি, ধানের ফুল আনা, যাত্রাপূজা, ভাণ্ডানী, শিয়াল ঠাকুর, ব্যাঙের বিয়াও, নয়া খৈ, পুষুনা, গোরখনাথ, গমীরা ঠাকুর, হুদুম দ্যাও প্রভৃতি[২০] জীবজন্তুর হাত থেকে রক্ষার জন্য যেসব পূজা আরাধনা রাজবংশী সমাজের বিভিন্ন এলাকায় প্রচলন আছে সেগুলি হল মহাকাল ঠাকুর, ভাণ্ডানী, শালেশ্বরী, বিষহরি, শিয়াল ঠাকুর প্রভৃতি।[২১] উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের মুখ্য দেবতা হল শিব। শিব প্রকৃতপক্ষে কৃষিদেবতা। কোচ রাজবংশও শৈবভাবাপন্ন ছিলেন, মহারাজা বিশ্বসিংহ সিংহাসনে আরোহন করেই শৈবধর্মে দীক্ষিত হন। শিবের অলংকার বৃষ, ষাঁড়, লিঙ্গ প্রকৃত অর্থে উর্বরা ভাবনার প্রতীক। উত্তরবঙ্গে শিব নানা নামে পরিচিত। বাণেশ্বর, জটিলেশ্বর, সর্বেশ্বর, মটেশ্বর, জল্পেশ্বর ইত্যাদি। আবার অনেক দেবতাই

শিবের প্রতিভূ যা বলা ভালো ভিন্নতর রূপ। যেমন মহাকাল, বুড়াঠাকুর, গোরখনাথ, সোনা রায়, মাশান প্রভৃতি। এই শিব উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় গারাম ঠাকুর হিসাবে পূজা পায়। গ্রাম থানে শিব মধ্যমণি হিসেবে অবস্থান করে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে কালী দেবতারও বহুল প্রচলন এবং বহু প্রকারভেদ। বিভিন্ন নামের কালীর সন্ধান পাওয়া যায় উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চলে। রাজবংশী সমাজের শাক্তভাবের প্রকাশ পাওয়া যায় এই কালী আরাধনায়। তারা কালী, শ্মশান কালী, রক্ষা কালী, বুড়ি কালী, শ্যামা কালী, পাঁচ কালী, পেটকাটি কালী, কাঁচা কালী প্রভৃতি। রাজবংশী সমাজে আরেক অন্যতম দেবতা মাশান। কোচবিহার জেলার অন্যতম লৌকিক দেবতা। বিভিন্ন নামে (১৮ প্রকার) পূজিত। উপাচারেরও বহু ব্যতিক্রমী প্রকারভেদ। দিনহাটা ঢিলমাশানকে ঢিল পাটকেল ছুঁড়তে হয়। সাধারণত কোন জলাশয়ের নিকটবর্তী স্থানেই মাশানের পাট নির্মিত হয়। অন্যতম ব্যতিক্রমী উপাচার — চালভাজা, মাছ পোড়া বিশেষ করে চ্যাং মাছ (ল্যাটা মাছ) পোড়া ইত্যাদি।

পূজা পার্বণের তালিকা [২২]

ক্রমিক নং	পূজা/উৎসব	কাল	অংশগ্রহণকারী	সঙ্গীত ও নাম	মন্তব্য
১	বিশুয়া	চৈত্র সংক্রান্তি	পুরুষ		কৃষি, জাদুবিশ্বাস, বন্যজন্তু আক্রমণ প্রতিরোধ
২	বৈশাখী আষাঢ়ী সেবা	বৈশাখ হইতে আষাঢ় মাস পর্যন্ত	পুরুষ	—	কৃষি
৩	গ্রামঠাকুর	জ্যৈষ্ঠ হইতে আষাঢ় মাস	পুরুষ	—	কৃষি
৪	তিস্তাবুড়ী	বৈশাখের যে কোন দিন	নারী	—	কৃষি ও নদীপূজা
৫	গচিবুনা	জ্যৈষ্ঠ হইতে আষাঢ়ের যে কোন দিন	পুরুষ	মেচিনী খেলার গান	কৃষি
৬	আমাতি	আষাঢ়	সাধারণ, ১টি অংশ শিশু নিয়ন্ত্রিত	—	কৃষি

৭	ডাকলক্ষ্মী	আশ্বিন-সংক্রান্তি	পুরুষ	ছড়াযুক্ত	কৃষি
৮	ধানের ফুল আনা	কার্ত্তিক	নারী	—	কৃষি
৯	বুড়াবুড়ী	অগ্রহায়ণ	শিশু	—	কৃষি
১০	বিষহরী	নাগ পঞ্চমী	সাধারণ	ভাসান	সর্পপূজা, সর্বমঙ্গল কামনা, প্রজনন, মানস বা বিবাহকালে পূজার ব্যবস্থা
১১	যাত্রাপূজা	শারদীয়া নবমী বা দশমী	সাধারণ	—	কৃষি, গোসেবা, বিদ্যার দেবী আরাধনা
১২	ভান্ডানী	শারদীয়া একাদশী হইতে পূর্ণিমা	সাধারণ	—	ভল্লুক ভীতি, কৃষি, সর্ব্বমঙ্গল কামনা
১৩	হুদুমদেও ও ব্যাঙের বিবাহ	জ্যৈষ্ঠ মাস	নারী	হুদুমদেও খেলার গান	অনাবৃষ্টিজনিত বরুণদেবতার পূজা, কৃষি
১৪	কালীঠাকুরাণী, গছা দেওয়া, বাখর খাওয়ানো	দীপান্বিতার অমাবস্যা	সাধারণ	চোর খেলা, চোর চুন্নীর গান	সর্ব্বমঙ্গল কামনা। মন্দিরে নিত্য পূজা বা শনি ও মঙ্গলবার নির্দিষ্ট পূজা। তরাই অঞ্চলে গ্রামঠাকুর পূজার কালীপূজা
১৫	সত্যপীর	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	পুরুষ	সত্যপীর	হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতি সমন্বয়
১৬	বোড়াভাসা	ভাদ্র মাসের যে কোনো বৃহস্পতিবার	নারী	—	ঐ
১৭	পাগেলাপীর	ফাল্গুনের ১৩ তারিখ	বালক	ছড়া	ঐ
১৮	রাখালঠাকুর	ঐ	ঐ	—	—
১৯	ভ্যাড়ার ঘর ছুবা	দোল পূর্ণিমার পূর্ব দিবস	ঐ	ভ্যাড়ার ঘর ছুবার গান	শবরোৎসবের ক্ষীণ স্মৃতি
২০	মদনকাম	বৈশাখ	পুরুষ	বাঁশ খেলার গান	বৃক্ষ পূজা, প্রজনন
২১	শিব ও তাঁহাব অনুষঙ্গী সমূহ	শিবচতুর্দশী	সাধারণ	—	কৃষি। অনুষঙ্গীদের বেলায় শিবচতুর্দশী ছাড়াও পূজা হইতে পারে
২২	জিগাঠাকুর	অনির্ধারিত	নারী	—	বৃক্ষ পূজা ও প্রজনন কৃষি

২৩	নয়াখৈ	অগ্রহায়ণের প্রথম দিবস বা পঞ্জিকানুসারে	সাধারণ	—	কৃষি
২৪	পুযুনা	পৌষ সংক্রান্তি	সাধারণ	—	কৃষি
২৫	শিয়ালঠাকুর	পুযুনার দিন	সাধারণ	—	কৃষি, পশুপূজা
২৬	শালশিরি	ফাল্গুন-চৈত্র	সাধারণ	—	বনদেবতা ও বৃক্ষ পূজা
২৭	গোরখনাথ	ফাল্গুন-বৈশাখ	পুরুষ	গোরখনাথের গান	কৃষি, গো পূজা
২৮	তুলসীঠাকুরাণী	প্রায়শঃ/দৈনন্দিন	সাধারণ	—	সর্বমঙ্গল দেবতা
২৯	জগন্নাথ ও বলরাম ঠাকুর	বৈশাখ	পুরুষ	কীর্ত্তন	বৈষ্ণব দেবতা
৩০	জন্মাষ্টমী ও দদিকাদো	শ্রাবণ	পুরুষ	—	কৃষি, কৃষ্ণপূজা
৩১	হনুমানঠাকুর	বৈশাখ	পুরুষ	—	ধ্বজাপূজা, পশু পূজা (?)
৩২	মাশান, জকা ইত্যাদি	শিবচতুর্দশী	সাধারণ	—	শিব অনুষঙ্গী
৩৩	ধরমঠাকুর	বৈশাখ	সাধারণ	ধরম ঠাকুরের গান	মিশ্রদেবতা
৩৪	গমীরাঠাকুর ও চড়ক	বিষুব সংক্রান্তি	পুরুষ	গমীরা ঠাকুরের গান বা গমীরা বা ভক্তিয়ার	শিব, কৃষি পূজা

রাজবংশী সমাজে অধিকারী, দেওসী, দেওধারাই পুরোহিত হিসাবে মান্য, তারাই ধর্মীয় আচার সংস্কারের কাজকর্ম সম্পন্ন করেন। অধিকারীরা দুই শ্রেণির — চক্রধারী এবং পত্রধারি। চক্রধারী অধিকারীরা তামার চক্র ধারণ করেন। তারা চক্র তৈরির অধিকারী, বিবাহ শ্রাদ্ধ শান্তি পূজার পাশাপাশি শিষ্যত্ব প্রদানের অধিকারী। পত্রধারীরা চক্রধারীর নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে পারেন ও বংশানুক্রমিক পূজার অধিকারী নন। পত্রধারীরা মাত্র এক পুরুষ পূজার অধিকারী হয়। রাজবংশী সমাজে ওঝা, দেওসী, ভৌরিয়াগণ রোগ নিরাময় করেন বলে তাদের শ্রদ্ধা সম্মান করা হয়।[২৩] অন্যদিকে 'দেওধা'-রা যজ্ঞ এবং অন্যান্য তান্ত্রিক কার্যাবলী সম্পন্ন করেন। কখনও কখনও তিনি ভগবান ও মানুষের মধ্যে মাধ্যম হিসাবে কাজ করে বিভিন্ন সমস্যার উপায় বলে

দিতে পারেন। 'ভৌরিয়া'গণ দেওধার মত কাজকর্ম সম্পন্ন করতেন। আজও রাজবংশী সমাজের মধ্যে 'ভওরিয়া'-র প্রতি বিশ্বাস রয়েছে। অন্যদিকে কীর্তিনীয়ারা রাজবংশীদের মৃত্যুর পর চিতা থেকে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত যে সমস্ত ধর্মীয় আচরণ সম্পন্ন করে তাতে কীর্তন করেন। আর এইজন্য তাদের কীর্তিনিয়া বলা হয়।[২৪] তবে উল্লেখ্য দেওধার কিংবা ভওরিয়া সংখ্যা একেবারে নগণ্য। তান্ত্রিক ভাবনার প্রভাব থাকলেও স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয় এবং এদের সংখ্যাও কমে যায়। সেইসঙ্গে সময়ের তালে তালে রাজবংশীদের ধর্মীয় আচরণ, দেবদেবী, ধর্মীয় বিশ্বাস প্রভৃতির মধ্যে বর্ণহিন্দুদের প্রভাব পড়েছে একথা বলা যায়। রাজবংশী সমাজের বর্ণহিন্দুদের প্রভাবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল — মাটির মূর্তির প্রচলন ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের দ্বারা পূজা অর্চনার রীতির প্রচলন। একথা স্বীকার করতেই হবে রাজবংশী সমাজে সাংস্কৃতিকীকরণ (Sanskritisation)-এর প্রভাব লক্ষণীয়।[২৫] স্বাধীনতার পরবর্তী কয়েক দশকে এই প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে পড়ে। রাজবংশী সমাজে বন্য হিংস্র জন্তুও দেবতা হিসাবে পূজিত। বস্তুত উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চল ছিল অরণ্যবেষ্টিত। হিংস্র জন্তুর অত্যাচার প্রতিহত করার প্রার্থনায় মহাকাল ঠাকুর রাজবংশী সমাজে পূজিত। তাই হাতি মহাকাল হিসাবেই রাজবংশী সমাজে পূজা পায়। আবার বিশুয়া পরবে (চৈত্র সংক্রান্তির দিন) কৃষিকৃত্যাদির পাশাপাশি শিকার করার মধ্যে ক্ষত্রিয় আচার এবং পশু শিকার বৃত্তির যৌথ প্রয়াসকে সূচিত করে। যদিও বিশুয়া পরবে বর্তমানে অন্যান্য আচার সংস্কার পালন করলেও শিকারের পর্বটি ক্বচিৎ দেখা যায়। কারণ বন্য প্রাণ সংরক্ষণ আইন এবং বর্তমান প্রজন্মের প্রথাগত বিশ্বাসের ভাঙন। বনের জ্বালানী কাঠ সংগ্রহকারীরা শালেশ্বরী ঠাকুরাণীর পূজায় ব্রতী হয়। আবার সর্পভীতির কারণে মনসা দেবী বিষহরা নামে পূজার প্রচলন রাজবংশী সমাজে আজও বহুল প্রচলিত। বলা যেতে পারে বিষহরি অন্যতম গৃহ দেবতা। ভাণ্ডানী দেবীর পূজাও রাজবংশী সমাজে প্রচলিত। কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা, জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি এলাকা এবং আলিপুরদুয়ার এলাকায় এখনও প্রতিবছর এই পূজার ও মেলার আয়োজন করা হয়। শারদীয়া দশমীর দিন ভাণ্ডানী দেবীর পূজা বলা যেতে পারে রাজবংশী সমাজের শারদীয়া উৎসবের নামান্তর। রাজবংশী সমাজে সরস্বতী পূজা হাল আমলের। দশমীর দিন 'যাত্রা পূজা'-ই মূলত রাজবংশী সমাজের সরস্বতী পূজা। দশমীর দিন যাত্রা পূজার আয়োজন করে রাজবংশী সমাজ। কৃষিকৃত্যাদির যাবতীয় যন্ত্রপাতি, গৃহস্থালীর

সরঞ্জাম বাড়িঘর লেপে মুছে উঠোনে তুলসী তলায় যাত্রা পূজার আয়োজন হয়। সেদিন গবাদি পশুরও পরিচর্যা করা হয়। অধিকারী পুরোহিত কিংবা বাড়ির বয়স্ক ব্যক্তিই পূজা করে থাকে। সেদিন হাল যাত্রা অর্থাৎ আড়াই পাক লাঙলে চাষ করে রবিশস্য চাষের সূচনা করে রাজবংশী সমাজ। আবার আমাতি অর্থাৎ অম্বুবাচীতে কৃষিকর্ম বন্ধ রেখে রজঃস্বলা বসুধাকে পূজা করা হয়। কামাখ্যা দেবীর ভাবনা রাজবংশী সমাজের মধ্যে লক্ষণীয়। রাজবংশী সমাজ উর্বরা সংস্কৃতির (Fertility culture) ধারক। অধিকাংশ দেবদেবী ও পূজা-পার্বণের মধ্যে এই ভাবনাই অন্তরালে থাকে; কৃষিকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানে তো বটেই। অন্যান্য দেবদেবীর ক্ষেত্রেও এই ভাবনাই সক্রিয়। আবার কৃষিকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে জাদু বিশ্বাসের উপস্থিতিও লক্ষণীয়। আদিম মানসিকতা ও প্রাকৃতিক বিরূপতার নিরাময় ভাবনার জাদু নিয়ন্ত্রিত কৃত্যাদির সংযোজন ঘটেছে। অলৌকিক বিশ্বাস, ভয়, ভাবনার প্রেক্ষিতেও বহু দেবদেবীর সংযুক্তি ঘটেছে রাজবংশী সমাজে। যেমন হুদুম দ্যাও কিংবা তিস্তাবুড়ির পূজা।

অংশগ্রহণের দিক থেকে রাজবংশী সমাজে প্রচলিত পূজা উৎসব সমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ১) বালকদের উদ্‌যাপিত পূজা উৎসব। যেমন - পাগলাপীর, চোরখেলা, ভ্যাড়ার ঘর ছুবা (পোড়ানো), বুড়া বুড়ি, হকাহকি, গোরখনাথ এবং আমাতির শেষ পর্যায়টি একান্তভাবে বালকদের মধ্যে সীমিত। ২) নারীদের উদ্‌যাপিত পূজা উৎসব। যেমন - ধানের ফুল আনা, মেচেনী খেলা, হুদুম দ্যাও পূজা, ভ্যাড়া ভাসান প্রভৃতি অনুষ্ঠান কেবল নারীদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। ৩) পুরুষদের উদ্‌যাপিত পূজা উৎসব এবং অন্যান্য প্রায় সব উৎসবগুলিই বয়স্ক পুরুষ দ্বারা পরিচালিত হয়।[২৬] রাজবংশী লোকচারণার বিভিন্ন প্রকার কৃষিকেন্দ্রিক তথা নারীকেন্দ্রিক পূজানুষ্ঠান নৃ-সাংস্কৃতিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। আসলে কৃষি সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমিতে অবস্থিত উর্বরাতন্ত্রের কৌমভাবনা এবং লোকায়ত জীবনের সহজ সরল অভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ এক লোকশৈলী। আবার বিভিন্ন প্রকার পূজানুষ্ঠানে 'মাড়েয়ানী'-র অধিকার নারীর প্রাধান্য তথা মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ইঙ্গিত দেয়।[২৭] সমাজে নারীরা ছিল পরিবারের একজন সদস্যা। সাধারণত গৃহকাজের বাইরেও তারা কৃষিকাজের যেমন - বিছন (ধানের চারা) তোলা, নিড়ানো, ধান কাটাই-মাড়াই-ঝাড়াই ইত্যাদি কাজে অংশ নিত। তবে অবস্থাপন্নদের ক্ষেত্রে ছবিটা আলাদা ছিল। সম্পন্ন পরিবারের বাইরে অন্য পরিবারের নারীদের অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। মহিলারা

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের কৃষিকেন্দ্রিক পূজা-পার্বণের তালিকা [২৯]

ক্রমিক নং	পূজা/উৎসব	কাল	অংশগ্রহণকারী	সঙ্গীত ও নাম	মন্তব্য
১	বিশুয়া	চৈত্র সংক্রান্তি	পুরুষ	—	কৃষি, জাদুবিশ্বাস বন্যজন্তু আক্রমণ প্রতিরোধ
২	বৈশাখী ও আষাঢ়ী সেবা	বৈশাখ হতে আষাঢ় পর্যন্ত	পুরুষ	—	কৃষি
৩	গ্রামঠাকুর	জ্যৈষ্ঠ হতে আষাঢ়	পুরুষ	—	কৃষি
৪	তিস্তাবুড়ি	বৈশাখের যেকোনো দিন	নারী	মেচেনী	কৃষি ও নদী পূজা
৫	গচিবুনা	জ্যৈষ্ঠ হতে আষাঢ় যেকোনো দিন	পুরুষ	—	কৃষি
৬	আমাতি	আষাঢ়	শিশু	—	কৃষি
৭	ডাকলক্ষ্মী	লক্ষ্মীপূজা	পুরুষ	ছড়াযুক্ত	কৃষি
৮	ধানের ফুল আনা	কার্ত্তিক	নারী	—	কৃষি
৯	বুড়াবুড়ি	অগ্রহায়ণ	শিশু	—	কৃষি
১০	যাত্রাপূজা	শারদীয়া নবমী বা দশমী	সাধারণ	—	কৃষি, দেবী বিদ্যার আরাধনা
১১	ভান্ডানী	শারদীয়া একাদশী হতে পূর্ণিমা	সাধারণ	—	কৃষি, ভল্লুক ভীতি, সর্বমঙ্গল কামনা
১২	হুদুম দ্যাও ও ব্যাঙের বিয়াও	জ্যৈষ্ঠ মাস	নারী	হুদুম দ্যাও খেলার গান	কৃষি, অনাবৃষ্টি জনিত পূজা
১৩	শিব ও তাহার অনুষঙ্গ সমূহ	শিব চতুর্দশী	সাধারণ	—	কৃষি, অনুষঙ্গীদের বেলায় শিব চতুর্দশী ছাড়াও পূজা হতে পারে
১৪	নয়া খৈ	অগ্রহায়ণের প্রথম দিন বা পুঞ্জিকানুসারে পরে	সাধারণ	—	কৃষি
১৫	পুষণা	পৌষ সংক্রান্তি	সাধারণ	—	কৃষি
১৬	শিয়াল ঠাকুর	নয়া খৈ	সাধারণ	—	কৃষি, পশুপূজা
১৭	গোরখনাথ	ফাল্গুন-বৈশাখ	পুরুষ	গোরখনাথের গান	কৃষি, গো-পূজা
১৮	জন্মাষ্টমী ও দধিকোদো	শ্রাবণ	পুরুষ	—	কৃষি, কৃষ্ণপূজা
১৯	গরীমাঠাকুর ও চড়কপূজা	বিষুব সংক্রান্তি	পুরুষ	গরীমাঠাকুরের গান বা গমীরা বা ভক্তিয়ার	শিব, কৃষিপূজা

পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারীও হতে পারতেন না। কিন্তু ঘর জামাইয়ের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ছিল। পণপ্রথা এবং বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। নারীদের বহুবিবাহ প্রথা প্রচলন ছিল না।[২৮]

রাজবংশী সমাজে প্রাচীনকাল থেকেই ব্রত কথার প্রচলন ছিল। আশা আকাঙ্ক্ষানিষ্ঠ বিশেষ ধর্মচারণে নাম ব্রত। এইসব ব্রতের প্রত্যেকটির সাথে সাথে ভিন্ন ভিন্ন কাম্য ফলদাতা দেবতার সম্পর্ক থাকে। মহিলারা মনোবৃত্তির তাড়নায়, সন্তান লাভ ও পারিবারিক সুখ সমৃদ্ধি কামনায় ব্রত পালন করে। অতীতে প্রকৃতির উপর মানুষের কোন ধরনের নিয়ন্ত্রণ ছিল না, দৈব নির্ভর ছিল পুরোমাত্রায়। সে কারণে দৈবশক্তির কোপ থেকে রক্ষা পেতে ও কৃপা লাভের আশায় রমণীগণ লৌকিক দেবদেবীর কাছে মানত করতেন ও আরাধনা করতেন। গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলে বর্তমান কিছু ব্রত লোপ পেয়ে থাকলেও এখনো রাজবংশী সমাজে ষাইটোল পূজা, সুবচনী পূজা, ধরম ঠাকুর, ষাট পূজা, কাতি পূজা প্রভৃতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন।[৩০] একথা বলা যায় রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি স্বাধীনতার পরবর্তী সময়েও অনেকটাই ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত ছিল। সত্তর-আশির দশকে সমাজ সংস্কৃতির বিবর্তন লক্ষ করা যায়। তথাপি রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির ব্যাপ্তি অতীতের মত না হলেও এখনও গ্রামীণ সমাজজীবনে সাধ্যের মধ্যে পালিত হয়। মূলত: আর্থসামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন এবং অভিবাসনের চাপে রাজবংশী গ্রাম সমাজের চরিত্র পাল্টে যায়। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে আদমসুমারি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র পুরুলিয়া ছাড়া সব জেলাতেই রাজবংশী মানুষের বসবাস যদিও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির রাজবংশী মানুষরা পেশাগত দিক থেকে কৃষি নয় মাছ ধরার পেশাতেই যুক্ত। স্বাভাবিকভাবে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরা দক্ষিণবঙ্গের রাজবংশীদের স্বগোত্রে ধরেন না। তাছাড়া রাজবংশী সমাজে মাছ বিক্রয় করা জাতি বিরুদ্ধ কাজ। তথাপি পরিসংখ্যানে তাদের সংখ্যা যুক্ত হয়েছে একমাত্র রাজবংশী পরিচয়ে। কিন্তু পেশাগত দিক দিয়ে শুধু নয় চেহারাগত দিক থেকেও তাদের গঠন প্রকৃতি আলাদা।[৩১]

উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের অনেক ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়। স্বাধীনতার সময়কাল অবধি নিজেদের মধ্যে স্থানভেদে রাজবংশীগণ উত্তরবঙ্গের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ জুড়ে আধিপত্য বজায় রেখেছিলেন। এই আধিপত্যের জোরে রাজবংশী জনগণ উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ জমির মালিকানা ভোগ করতেন। নিজ জমিতে তারা বিরাজ করতেন রাজার হালে। কিন্তু স্বাধীনতার

বিভিন্ন আদমসুমারীতে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের সংখ্যার পরিবর্তনের নমুনা এবং শতকরা হার

জেলা	১৯৫১	%	১৯৬১	%	১৯৭১	%	১৯৮১	%	১৯৯১	%
দার্জিলিং	১৫৮৯৪	৩.০০	৩১৮৮৭	৩.৫০	৩১৫০৫	৩.০৬	৬২৭৭০	৩.৬০	৯৬৭৪৫	৭.৪৪
জলপাইগুড়ি	১৭২৭১০	৩২.৬৮	৩১৬০২০	৩৫.১৯	৩২৯১৯১	৩২.০৩	৫১৪১৭৪	২৯.৪৯	৬৫৬০৭৩	২৩.৪২
কোচবিহার	২৫২০৬৯	৪৭.৭	৪১৮৮৩৯	৪৬.৬৩	৪৮১৩০৪	৪৬.৮৪	৭১৪২২১	৪০.৯৬	৮৬৫৬২২	৩৯.৮৬
পশ্চিম দিনাজপুর	৬৭৪৬৯	১২.৭৮	৯৩৩৭১	১০.৪০	১৩৪৯৭৬	১৩.১৩	৩৬৯০১৫	২১.১৬	৪৮৯৬৪২	১৫.৬৫
মালদা	২০২৯৪	৩.৮৪	৩৮৪৪৩	৪.২৮	৫০৬৯৩	৪.৯৪	৮৩৪৬৩	৪.৭৯	১১৪৬৯৭	৪.২৯

সূত্র : ভারতের আদমসুমারি ১৯৫১, ১৯৬১, ১৯৭১, ১৯৮১, ১৯৯১

পরে উত্তরবঙ্গের জনসংখ্যার আমূল পরিবর্তন ঘটে ফলে রাজবংশী সহ অ-রাজবংশী জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলে একাধিক সমস্যার সৃষ্টি হয় যা রাজবংশী জনগণের আর্থসামাজিক জীবনধারায় প্রতিফলিত হয়।[৩২] স্বাধীনতার উত্তরকালে বহু রাজবংশী সহ অ-রাজবংশী মানুষ ওপার বাংলা থেকে উত্তরবঙ্গের উদ্বাস্তু (Refugee) হয়ে আসতে থাকে। এর ফলে উত্তরবাংলার স্থানীয় তথাকথিত রাজবংশী মানুষের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এমনকী সামাজিক জাত্যাভিমানের (ethnocentric) প্রবণতা বাড়তে থাকে। উদ্বৃত্ত মানুষের উপস্থিতিতে এই অঞ্চলে জমির উপর চাপ বাড়তে থাকে। ফলে রাজবংশী জোতদার ও কৃষকদের (আধিয়ার) মধ্যে মালিকানা সত্ত্বের পার্থক্য, শ্রেণি পার্থক্যের বৈশিষ্ট্যে প্রতীয়মান হয়।[৩৪] জোতদার-আধিয়ারী ব্যবস্থা ছিল উত্তরবঙ্গের কৃষি ব্যবস্থার মূল মৌলিক কাঠামো। অনেক এলাকা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় ছিল — দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ির কিছু অংশ জমিদারি প্রথার আওতায় ছিল। জলপাইগুড়ি জেলার পশ্চিম ডুয়ার্স ও কোচবিহারে জমিদারি প্রথা ছিল না। বাৎসরিক কিছু খাজনার ভিত্তিতে সরকার এখানে ধনী কৃষক জোতদারদের জমি বিতরণ করেন।[৩৫] এই এলাকায় ভাগচাষি ব্যবস্থা বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে কারণ জমির প্রাচুর্যের তুলনায় শ্রমিক শ্রেণির পরিমাণ কম ছিল। ফলস্বরূপ শ্রমিকের তুলনায় জমির মূল্য নগণ্য ছিল।[৩৬] বিশাল সংখ্যার অভিবাসন জনসংখ্যা কেবলমাত্র জমির চাহিদার ক্ষেত্রেই সমস্যার সৃষ্টি করল না, জমির মূল্যকেও বৃদ্ধি করল। জমির এই অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধিতে স্থানীয় জনগণ প্রলুব্ধ হয়ে জমি বিক্রির প্রবণতায় পা বাড়ায় এবং ছোট জোতদার ও মধ্যবিত্ত জোতদাররা শীঘ্রই অভিবাসিত নতুন Landed Gentry শ্রেণির অধীনে চলে আসে। রংপুর ও দিনাজপুরে বড় বড় জোতদার ও অ-কৃষিজীবী লোকেরা বেশিরভাগ জোত দখল করে। জলপাইগুড়ি জেলায় যে সমস্ত জোত রাজবংশীরা অধিকার করেছিল, তাদের সংখ্যা ক্রমাগত কমতে থাকে। অন্যদিকে বর্ণহিন্দু বাঙালি, মাড়োয়ারী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকদের জোতের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে কোচবিহার জেলার ৫৪ শতাংশ খাজনা বহিরাগতদের কাছে থেকে আসত।[৩৭] প্রকৃতপক্ষে সে-সময় সমগ্র উত্তরবঙ্গ জুড়ে রাজবংশীদের হাত থেকে অ-রাজবংশীদের হাতে জমির হস্তান্তরের ঘটনা একটি সাধারণ চিত্রে পরিণত হয়।[৩৮] অ-রাজবংশীদের হাতে জমির স্থানান্তকরণের পশ্চাতে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো উত্তরবঙ্গে বিশাল পরিমাণ অভিবাসন। প্রথম দিকে এই অঞ্চলের

প্রতি আকর্ষণের কারণ ছিল জমির প্রাচুর্য, ব্যবসার সম্ভাবনা, সরকারি চাকুরির সম্ভাবনা। চা বাগান গড়ে ওঠার জন্য বাবু সম্প্রদায়ের ও শ্রমিক শ্রেণির কাজের সুযোগের সম্ভাবনাও ছিল। অন্যদিকে স্থানীয় রাজবংশীরা কৃষি ছাড়া অন্য পেশায় আগ্রহী ছিল না। ফলে অভিবাসী লোকের সেই স্থান দখল করে নেয়। অভিবাসিত লোকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠেনি এখানকার ভূমিপুত্ররা।[৩৯] অভিবাসন উত্তরবঙ্গের জনসংখ্যার ধরনকে পরিবর্তন করে দেয়। একথা উল্লেখ্য যে বিংশ শতকে ব্রিটিশ শাসনকালে অভিবাসনের ঘটনা বিশেষত আসাম, উত্তরবঙ্গ ও ত্রিপুরায় ঘটেছে তাতে সম্ভবত ৩০ শতাংশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও অভিবাসনের ধারা অব্যাহত এবং এই উদ্বাস্তু লোকগুলো ২/৩ অংশই ছিল পূর্ব বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশের)।[৪০] তাদের অধিকাংশই পুরোনো জায়গায় পরিস্থিতির কারণে আর ফিরে যেতে পারেননি। ১৯৫১-১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারি থেকে জানা যায় প্রতি দশকে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধি পশ্চিমবঙ্গের থেকে সবসময় বেশি ছিল।

পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনামূলক হার (শতাংশ) [৪১]

আদমসুমারি	পশ্চিমবঙ্গ	উত্তরবঙ্গ
১৯৫১-৬১	৩২.৮০	৪০.৪৯
১৯৬১-৭১	২৬.৪৭	৩৩.০১
১৯৭১-৮১	২২.৯৬	২৭.৬৩
১৯৮১-৯১	২৪.৫৫	২৭.৬১
১৯৯১-২০০১	১৭.৮৪	২২.৪৩

সূত্র : পশ্চিমবঙ্গ আদমসুমারি রিপোর্ট (পশ্চিমবঙ্গ) ১৯৫১, ১৯৬১, ১৯৭১, ১৯৮১, ১৯৯১ ও ২০০১।

অবশ্য উত্তরবঙ্গের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পশ্চাতে একাধিক কারণের অবতারণা করা যেতে পারে। প্রথমত: উত্তরবঙ্গের অবস্থান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সীমারেখার মধ্যে এবং এই ভূখণ্ড পূর্ব ভারতের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। এতদ্অঞ্চলের অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থান ও অভিবাসন ঘটাতে সাহায্য করেছিল। অভিবাসনের সবচেয়ে চরম পরিস্থিতি ঘটে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইন্দো-পাক যুদ্ধের সময় এবং তার অব্যবহিত পরবর্তীকালে। অভিবাসন ও উদ্বাস্তুর অনুপ্রবেশের

প্রবাহ উত্তরবঙ্গের অত্যধিক চাপ সৃষ্টি করে ও উত্তরবঙ্গের আর্থ সামাজিক কাঠামোর ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে।[৪২] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পূর্ব পাকিস্তান ছাড়াও উত্তরবঙ্গে অভিবাসনের জন্য নেপাল, ভুটান এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের জাতি দাঙ্গাও অনেকটা দায়ী ছিল। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে উত্তরবঙ্গে উদ্বাস্তুর অনুপ্রবেশ, ১৯৬০-৬১ খ্রিস্টাব্দে আসামের 'বাঙ্গাল খেদা' আন্দোলনের ফলে বাঙালি অনুপ্রবেশ, মেঘালয়, ভুটান থেকে নেপালিদেরও অনুপ্রবেশ ঘটে।

বিমান দাশগুপ্ত তাঁর 'A Note on the Rajbanshi of Eastern India with Special Reference to Social Movement' শীর্ষক প্রবন্ধে দাবি করেছেন উত্তরবঙ্গ হল রাজবংশীদের স্বভূমি (Home Land) এবং তারা এতদঞ্চলের জমির উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তিনি একথাও স্বীকার করেছেন যে তপশিলী জাতির মোট ৫০ শতাংশ জনগণ রাজবংশী জাতিভুক্ত। এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠী শিক্ষা, অর্থনীতি, সামাজিক; পেশাগত ক্ষেত্র এমনকী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী থেকে বহুগুণে পশ্চাৎপদ। এই পশ্চাৎপদ অবস্থা ও চেতনাবোধের অভাব রাজবংশী জাতিকে অনেকটাই পশ্চাতে রেখেছে। তাছাড়া রাজবংশী জনগণ গতানুগতিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে তারা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে অসমর্থ হয়ে পড়ে ও বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। এ প্রসঙ্গে বলা বাহুল্য এই রাজবংশী সমাজ প্রথমদিকে কোন সামাজিক সমস্যার মুখোমুখি হয়নি। বিশাল জমির মালিকানায় নিরুদ্বিগ্ন জীবন কাটাত। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে রাজবংশী সহ বহু অরাজবংশী উদ্বাস্তুর অনুপ্রবেশ ও স্থায়ীভাবে বসবাসের ফলে যেমন জমির উপর চাপ সৃষ্টি হয় তেমনি জনবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটে এবং তাদের গতানুগতিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনে রাজবংশী সমাজ নিজেদের সামলে নিতে সামর্থ হয়নি। ফলে তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেকটাই পশ্চাৎপদ থেকে যায়; অবজ্ঞা ও অবহেলার পাত্রে পরিণত হয়। এ অবস্থায় রাজবংশীরা আত্মপরিচয়ের সংকটেও ভুগতে শুরু করে।[৪৩]

জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের জমিদার-জোতদার প্রথার অবসান এবং ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ভূমি সংস্কার আইন ভূমি নির্ভর এই রাজবংশী সমাজকে দিশেহারা করে দেয়। জমি অধিগ্রহণ আইনে বলা হয় ৭২ বিঘার বেশি জমি কারো নামে থাকবে না ফলে উত্তরবাংলার এক বিশাল সংখ্যক জোতদার তাদের জমি হারায়। জমিহীন কৃষকদের খাস জমি বিতরণ করা হয়।

রাজবংশী জোতদাররা এর ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হলেও রাজবংশী সমাজের ভূমিহীন কৃষকরা তেমন লাভবান হয়নি।[৪৪] ভূমি সংলগ্ন আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে যুক্ত ফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের আমলে ১৯৬৭-৭০ খ্রিস্টাব্দে এক মিলিয়ন একর জমি বিতরণ করা হয় যার ফলে পশ্চিমবঙ্গে জমিদার শ্রেণির মেরুদণ্ড ভেঙে যায়।[৪৫] উত্তরবঙ্গের জোতদার শ্রেণিও এর মধ্যে পড়ে। রাজবংশী সমাজের তথা উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রথম ধাক্কা জমিদারি ব্যবস্থার বিলোপ আইন ১৯৫৩ সালে প্রবর্তিত হওয়ার পর। যদিও জমিদারি প্রথা বিলোপের সাথে সাথে উত্তরবঙ্গের কৃষিক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে। কিন্তু এই আইনে রাজবংশী সমাজের তথাকথিত জোতদাররা বিপুল পরিমাণ জমি হারায়। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের ভূমি সংস্কার আন্দোলনের প্রথম পর্যায় শুরু হয়। ’৬৭র ভূমি সংস্কার আন্দোলন Landed Gentry সমাজের আর্থ-সামাজিক প্রভুত্বের মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলে।[৪৬] ’৬৭র পর ১৯৭৭ সালে ‘অপারেশন বর্গা’ আইনে উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক তথা পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক চিত্র আবার পাল্টে যায়। ভাগচাষিদের ‘নথিভুক্তিকরণ’ ও ‘ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্বৃত্ত জমির খাসকরণ’ জোতদার, জমিদার শ্রেণির আর্থ সামাজিক অবস্থাকে দুর্বল করে দেয়; অপারেশন বর্গার পর তা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়।[৪৭] সামগ্রিকভাবে কৃষিনির্ভর রাজবংশী সমাজের মানুষজন অসহায় হয়ে পড়ে। কারণ রাজবংশী ভাগচাষিরা সম্পূর্ণভাবে জোতদারদের উপরই নির্ভরশীল ছিল এবং তারা বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠে নি। রাজবংশী ভাগচাষিদের একটি অন্যতম প্রবণতা ছিল তারা রাজবংশী জোতদারদের অধীনেই জমি চাষ করবেন; ফলে জোতদার যখন জমি হারালেন তখন রাজবংশী ভাগচাষিরা সংকটাপন্ন হলেন। আধুনিক প্রযুক্তিতে চাষবাসেও তারা অভ্যস্ত কিংবা আগ্রহী ছিলেন না। ফলত তারা পাট্টা বন্টনে পাওয়া জমিও ধরে রাখতে পারলেন না। জমি হস্তান্তরিত হল দ্রুত।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই তেভাগা থেকে অপারেশন বর্গার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গের ভূমিহীন কৃষকরা প্রান্তিক কৃষক হয়েছেন, প্রান্তিক কৃষকরা সম্পন্ন কৃষক হয়েছেন। অন্যদিকে রাজবংশী জোতদারদের অবস্থা করুণ হয়েছে, রাজবংশী সমাজ জীবনের সম্পর্ক খারাপ হয়েছে। আগে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের জোতদার ও আধিয়ারের সম্পর্ক অনেকাংশে মধুর ছিল। রাজবংশী সমাজে জোতদার দেউনীয়া হিসাবে পরিচিত ছিল। দেউনীয়া বা গারস্ত

আধিয়ারের ছেলের বা মেয়ের বিয়ে, অন্নপ্রাশন, পূজা পার্বণ এমনকী চাষবাসের সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেন। বিয়ের সময় মঙ্গলঘটের জল ছিটিয়ে দেউনীয়া কিংবা গিদ্খানী পানিছিটা বাবা-মাও হতেন। বস্তুত: জোতদার ও আধিয়ার সমাজ আত্মীয়তার বন্ধনে পরস্পরের নিকটতম ছিলেন। তেভাগা আন্দোলন কিংবা বর্গা অপারেশনে রাজবংশী ভাগচাষি আধিয়ার সমাজের উপকারের চেয়ে ক্ষতিই হয়েছে বেশি। কারণ আধিয়ার ছিল সম্পূর্ণভাবে জোতদারের উপর নির্ভরশীল। সেই সম্পর্কের অবনতি ঘটে এই আন্দোলনের ফলে। স্বাভাবিকভাবে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যার প্রভাব পড়ে।

আবার আধুনিক প্রযুক্তিগত উন্নতিকে সহজে গ্রহণ করেনি। ফলত: রাজবংশী কৃষকসমাজ দ্রুত পিছিয়ে পড়ে এবং বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠে না। সুদীর্ঘকালের লালিত কৃষি সমাজ ভেঙে পড়ে, আর্থ সামাজিক কাঠামো দুর্বল হয় এবং তার প্রভাব সরাসরি পরে পরিবার, সমাজ থেকে সংস্কৃতির পরিসরে। স্বাভাবিকভাবে রাজবংশী সমাজ-সংস্কৃতি শূন্য দশকের আগে আবার নতুনভাবে গড়ে উঠতে থাকে। ইতিমধ্যে রাজবংশী সমাজের চিরায়ত ভাবনারও পরিবর্তন শুরু হয়। রাজবংশী মানুষেরা ধীরে ধীরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনগ্রসর শ্রেণিতে পরিণত হয় এবং তাদের মধ্যে অনেকে বাসস্থান ছেড়ে পার্শ্ববর্তী রাজ্যে বা শহরে জীবিকার তাগিদে অসংগঠিত শ্রমিক রিক্সাচালক এমনকি domestic servant হিসাবে কাজ করতে বাধ্য হয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিংয়ের একদা জোতদারের বংশধররা এখন কেউ দিনমজুর, কেউবা শহরে গ্রামে রিক্সা, ভ্যান চালিয়ে দিন গুজরান করছে আর তাদের বাড়ির মহিলারা শহরে বাবুদের বাড়িতে ঝিয়ের চাকরানীর কাজ করছেন। এইভাবে রাজবংশীরা তাদের পিতৃভূমির অধিকার থেকে বিচ্যুত হয়ে কৃষিজীবী থেকে দিনমজুরে পরিণত হয়েছে।[৪৮] আবার এই সময় আর্থিক দিক থেকে অগ্রসর রাজবংশী শ্রেণির মধ্যে নগরাভিমুখী প্রবণতা, ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানো, কৃষির সাথে অন্যান্য পেশা গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ফলে কিছু কিছু রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আচার আচরণে গতি (Dynamics) লক্ষ করা যায়। বর্ণহিন্দুদের প্রভাবে রাজবংশী Landed Gentry শ্রেণির পোশাক, জীবনশৈলী, বিবাহ রীতি, ধর্মীয় আচরণে কিছুটা পরিবর্তন দেখা যায়।[৪৯] ধর্মীয় ক্ষেত্রে মূর্তি পূজায়ও চিরাচরিত রাজবংশী পুরোহিত

অধিকারীর পরিবর্তে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের আহ্বান রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির সামাজিক রীতি পরিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক বলা যায়।[৫০] রাজবংশী জাতির এই Elite শ্রেণির মধ্যে জাত্যাভিমানের চরিত্র ফুটে উঠে। তারা অনগ্রসর রাজবংশী মানুষজন থেকে নিজেদের কিছুটা দূরে সরে রাখার প্রবণতা দেখায় তাদের সামাজিক আচার আচরণের মধ্যে। এইভাবে গোত্রহীন রাজবংশী সমাজে উচ্চ-নীচ বিভেদের সৃষ্টি হয়।[৫১] সেইসঙ্গে রাজবংশী সমাজে মৌলিক পরিবারের (Nuclear Family) সংখ্যা বাড়তে থাকে। যৌথ পরিবারগুলির দ্রুত ভাঙন শুরু হয়। ফলত নৃ-গোষ্ঠীগতভাবে যৌথ পরিবার ব্যবস্থার সঙ্গে কৃষিজীবী সমাজব্যবস্থার যে নিবিড় সম্পর্ক প্রচলিত ছিল সেক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আবার বৈবাহিক সম্পর্ক (Conjugal relationship) ও আত্মীয়তার সম্পর্কেও (Consanguineal relationship) মৌলিক পরিবারের ভাবনা চিরায়ত যৌথ পরিবার ভাবনায় ভিন্ন প্রভাব ফেলে। স্বাভাবিকভাবে সূক্ষ্ম বিভাজন ধীরে ধীরে কার্যকরী হয়ে ওঠে। যা পরিবর্তনের সপক্ষেই কাজ করে।

এই পরিবর্তনের প্রবণতা নয়ের দশকের গোড়া থেকে আরও বৃদ্ধি পায়। আত্মসচেতনতাও বৃদ্ধি পায় কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে যায়। রাজবংশী মানুষজন শহরমুখী হয়, অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজের সন্ধানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুরুষ মহিলা কার্যক্ষেত্রে একযোগে জীবন-জীবিকার স্বার্থে যে কোন ধরনের কাজে যুক্ত হয়। যুব সম্প্রদায়ের একটা অংশ ভিন রাজ্যে কাজের সন্ধানে পাড়ি দেয়। স্বাভাবিকভাবে চিরায়ত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বড়সড় পরিবর্তন দেখা যায়। গ্রামীণ জীবনের সংস্কৃতিচর্চার পরিসরটি সঙ্কুচিত হয়। অনেক লৌকিক আচার-সংস্কারও লোকান্তরিত হতে থাকে। গ্রামীণ মানুষের ঐকান্তিক চেষ্টা এবং ধর্মীয় বৃত্তের। আর যারা বাইরে গিয়ে ভাগ্যানুসন্ধানে ব্যস্ত তারাও নিজস্ব সংস্কৃতির পরিসর থেকে বিচ্যুত হয়ে ভিন্ন সংস্কৃতির বৃত্তে আবর্তিত হয়। ফলত: সমাজ ও সংস্কৃতির সংকট রাজবংশী সমাজকে আক্রান্ত করে। সবশেষে উল্লেখ্য এবম্বিধ সমস্যার মাঝেও শূন্য দশকে নিজস্ব সংস্কৃতি ভাষার ক্ষেত্রে কিছু রাজবংশী মানুষ সচেতন হয় এবং পরবর্তী সময়ে ধীরে এবং দেরিতে হলেও নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতির পক্ষে সংঘবদ্ধ হয় এবং প্রয়াস চালিয়ে যায় সমাজ সংগঠন ও ঐতিহ্য রক্ষার তাগিদে।

তথ্যসূত্র :

১. Hamilton, Dr. Bukanan; Account of the District or Zilla of Rangpur, 1810, India Office Library, Appendix - III of the District Cencus Hand Book Jalpaiguri and Cooch Behar, WB, 1915 The Koch and Rajbanshis both being part of the larger Bodo Slock belong to the same caste.

২. Hunter, W W; A Statistical Account of Bengal Vol V (London : Turbner & Co 1872) Page - 43

৩. রায়, নির্মল চন্দ্র; স্বাধীনতা উত্তরপর্বে রাজনৈতিক চালচিত্র : প্রসঙ্গ রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতি, ১৯৪৭ - পরবর্তী উত্তরবঙ্গ - আনন্দগোপাল ঘোষ; নির্মল চন্দ্র রায় (সম্পাদিত), সংবেদন, বি এস রোড, মালদা পৃষ্ঠা - ১৫৯

৪. বর্মন, উপেন্দ্র নাথ; 'ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিত', জলপাইগুড়ি, প্রথম প্রকাশ, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, চতুর্থ সংস্করণ, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা - ১৬

৫. সরকার, ইছামুদ্দিন; (সংকলিত) ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ রাজবংশী সমাজের আত্মপরিচয়, বর্মা, সুখবিলাস; এন. এল. পাবলিকেশন, ডিব্রুগড়, অসম, ২০০২, পৃষ্ঠা - ১৭৩

৬. নাগ, হিতেন; কামতাপুর থেকে কোচবিহার, মিত্র এন্ড ঘোষ পাবলিশার্স, ১ম খণ্ড, ২০১০, কল, পৃষ্ঠা - ৭২-৭৩

৭. বিশ্বাস, অশোক; বাংলাদেশের রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০০৫, পৃষ্ঠা - ৩৬

৮. বর্মা, সুখবিলাস; প্রবন্ধ : রাজবংশী সমাজের আত্মপরিচয়, পৃষ্ঠা - ১৭৩

৯. জি বি পলিটিকান (পলিটিক্যাল) ফাইল নং 8A-8B, ডিসেম্বর ১৯৩১, প্রসেডিংস নং ৩৯৪-৪০৬ অধিকারী, মাধব চন্দ্র; রাজবংশী সমাজ ও মনীষী পঞ্চানন বর্মা, ১ম খণ্ড, রিডার্স সার্ভিস, কলকাতা - ৭৫, ২০১৪, পৃষ্ঠা - ৯৪

১০. অধিকারী, মাধব চন্দ্র; রাজবংশী সমাজ ও মনীষী পঞ্চানন বর্মা, ১ম খণ্ড, রিডার্স সার্ভিস, কল - ৭৫, ২০১৪, পৃষ্ঠা - ৮

১১. ঘোষ, আনন্দগোপাল ও দাস, নীলাংশু শেখর; 'উত্তরবঙ্গের ইতিহাস ও সমাজ', দীপালি পাবলিশার্স, শিলিগুড়ি, ২০০৯, পৃষ্ঠা - ১৩৫

১২. জি বি ফাইল নং 1R - 2 অব ১৯৩৩, এপ্রিল ১৯৩৪ প্রসেডিংস নং ৯-৩১ সিরিয়াল নং - ৫০

১৩. অধিকারী, মাধব চন্দ্র; রাজবংশী সমাজ ও মনীষী পঞ্চানন বর্মা, ১ম খণ্ড, রিডার্স সার্ভিস, কল - ৭৫, ২০১৪, পৃষ্ঠা -

১৪. Risley, H. H.; The Tribes and Castes of Bengal Vol -I, rpt. Calcutta 1981. Page - 494

১৫. Gruning, J F; 'Eastern Bengal and Assam District Gazetteers' Jalpaiguri, Allahabad 1911, Page 32-33

Strong, F. W.; 'Bengal District Gazetteers' Dinajpur Allahabad 1912 Page 34-43

Risley, H. H.; The Tribes and Castes of Bengal Vol I rpt Calcutta 1981 Pp 497-7

১৬. Sanyal, Charuchandra; The Rajbanshis of North Bengal, The Assiatic Society Calcutta 1965 Page - 91

Hunter, W W; 'A Statistical Accounts of Bengal' Vol - X 1876 rpt 1984 Page - 34

১৭. Basu, Swaraj; 'Dynamics of Caste Movement : The Rajbanshis of North Bengal (1910-1947) New Delhi 2005 Page - 41

১৮. হুসাইন, আমজাদ; (সম্পাদিত) কামরূপ থেকে কোচবিহার (প্রবন্ধ), রায়, ড. জীতেশ চন্দ্র; উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট, সুহৃদ পাবলিকেশন কল - ৭৩ পৃষ্ঠা - ১৪৩

১৯. GOB, District Gazetteer, Rangpur 1977.

২০. দেব, রণজিৎ; উত্তরবঙ্গের জনজীবন ও সংস্কৃতি রতন বিশ্বাস (সম্পাদিত) উত্তরবঙ্গের জাতি ও উপজাতি, কল - পুনশ্চ, ২০০১, পৃষ্ঠা - ৭১

বিশ্বাস, অশোক; বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৫, পৃষ্ঠা - ৬০

২১. বিশ্বাস, অশোক; ঐ, পৃষ্ঠা - ৬০

২২. রায়, গিরিজাশংকর; উত্তরবঙ্গের রাজবংশী পূজা-পার্বণ, এন. এল. পাবলিকেশন, ডিব্রুগড়, পৃষ্ঠা - ৮-১০

২৩. বিশ্বাস, অশোক; ঐ, পৃষ্ঠা - ৬১

২৪. অধিকারী, মাধব চন্দ্র; রাজবংশী সমাজ ও মনীষী পঞ্চানন বর্মা, ১ম খণ্ড, রিডার্স সার্ভিস, ২০১৪ কল - ৭৫, পৃষ্ঠা - ২৯

২৫. ঐ, পৃষ্ঠা - ২৯

২৬. রায়, জীতেশ চন্দ্র; উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট (প্রবন্ধ), আমজাদ হুসাইন (সম্পা), কামরূপ থেকে কোচবিহার, সুহৃদ পাবলিকেশন, কল - ৭৩, পৃষ্ঠা - ১৪৫

২৭. ঐ, পৃষ্ঠা - ১৪৫

২৮. রায়, গৌরাঙ্গ চন্দ্র; কোচবিহারের রাজবংশী সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক রূপান্তরের রূপরেখা (প্রবন্ধ) পৃষ্ঠা - ১৫৫

২৯. রায়, জীতেশ চন্দ্র; উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট (প্রবন্ধ), আমজাদ হুসাইন (সম্পা), কামরূপ থেকে কোচবিহার, সুহৃদ পাবলিকেশন, কল - ৭৩, ২০১৪, পৃষ্ঠা - ১৪৫

৩০. বিশ্বাস, অশোক; বাংলাদেশের রাজবংশী : সমাজ ও সংস্কৃতি, বাংলা একাডেমী ঢাকা, পৃষ্ঠা - ৬১

৩১. রায়, গিরিজাশংকর; উত্তরবঙ্গের রাজবংশী পূজা-পার্বণ, এন. এল. পাবলিকেশন, ডিব্রুগড়, পৃষ্ঠা - XVII

(১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুসারে একমাত্র পুরুলিয়া জেলা ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের অন্য সব জেলাতেই রাজবংশীদের অবস্থানের কথা জানা যায়। পরিসংখ্যানটি নিম্নরূপ :-

কোচবিহার — ৪১৮৮৯৩
জলপাইগুড়ি — ৩১৬০২০
দার্জিলিং — ৩১৪৭২
পশ্চিম দিনাজপুর — ৯৩৩৭১
মালদহ — ৩৮৪৪৩
বর্ধমান — ১১১৯৭
বীরভূম — ৫৫৭৫
বাঁকুড়া — ৩৯৮
কলিকাতা — ২৭২৯
হাওড়া — ৩৬২৪৬
হুগলী — ২০১৬৫
মেদিনীপুর — ৬৪৬১২
মুর্শিদাবাদ — ২৯৭৪২
নদীয়া — ১২৭৩৯
২৪ পরগণা — ১২০১২৪
১২০১৭০৬

পরিসংখ্যানটিতে ধৃত পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলার রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজকে উদ্ভবের ক্ষেত্রে একই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে না। অন্যান্য জেলার রাজবংশীরা কৃষিজীবী হইলেও মূলত: মৎস্যজীবী, কিন্তু উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের একমাত্র জীবিকা কৃষিকর্ম। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের দেহ গঠন, ভাষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির সহিত তাহার সামান্য সাদৃশ্য নাই বলিয়াই মনে হয়।)

৩২. অধিকারী, মাধব চন্দ্র; রাজবংশী সমাজ ও মনীষী পঞ্চানন বর্মা, রিডার্স সার্ভিস, পৃষ্ঠা - ৩৩

৩৩. মুখোপাধ্যায়, শিবশংকর; জলপাইগুড়ি জেলার সামাজিক কাঠামো, মধুপর্ণী, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা - ১৫২, কোচবিহার জেলার সামাজিক কাঠামো, মধুপর্ণী, কোচবিহার জেলা সংখ্যা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা - ১১০

৩৪. অধিকারী, মাধব চন্দ্র; রাজবংশী সমাজ ও মনীষী পঞ্চানন বর্মা, ১ম খণ্ড, রিডার্স সার্ভিস, কল - ৭৫, ২০১৪, পৃষ্ঠা - ৬৬

৩৫. Roy, R; Change in Bengal Society, 1760-1850, Delhi 19, P - 203

৩৬. Taniguchi Shinkichi, Structure of Agrian Society in Northeren Bengal, 1765-1800. (অপ্রকাশিত গবেষণা সন্দর্ভ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ২০৫-২০৬)

৩৭. Sarkar, Sekhar; Land Settlement and Revenue Administration and Taxation under the Maharajas of CoochBehar, Unpublished Ph. D. Thesis, NBU, 1990 pp VIII 32

৩৮. অধিকারী, মাধব চন্দ্র; রাজবংশী সমাজ ও মনীষী পঞ্চানন বর্মা, ১ম খণ্ড, রিডার্স সার্ভিস, কল - ৭৫, ২০১৪, পৃষ্ঠা - ৪০

৩৯. Dasgupta, Ranjit; Economy Society and Politics in Bengal, Jalpaiguri 1809-1947 Calcutta Page - 31-32

৪০. অধিকারী, মাধব চন্দ্র; রাজবংশী সমাজ ও মনীষী পঞ্চানন বর্মা, ১ম খণ্ড, রিডার্স সার্ভিস, কল - ৭৫, ২০১৪, পৃষ্ঠা - ৪০

৪১. অধিকারী, মাধব চন্দ্র; রাজবংশী সমাজ ও মনীষী পঞ্চানন বর্মা, ১ম খণ্ড, রিডার্স সার্ভিস, কল - ৭৫, ২০১৪, পৃষ্ঠা - ৬৪-৬৫

৪২. ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় সম্মেলন, উতজাআস, দিনহাটা, ১৯৯১, পৃঃ - ১০, ইতিহাস অনুসন্ধান ১৯, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০০৫, পৃ: ৩৩৯-৪০

৪৩. অধিকারী, ড. মাধব চন্দ্র; ঐ, পৃষ্ঠা - ৬৩

৪৪. ঐ, পৃষ্ঠা - ৪১

৪৫. Banerjee, D.; Land Reform in West Bengal, Remembering Harekrishna Kongar and Benoy Chowdhury, E P W, Vol XXXVI no 21 and 22 P - 1797

৪৬. D. Banerjee; Land Reform in West Bengal, E P W, Vol 36 and 37 Page - 179

৪৭. Ibid Page 179

৪৮. Ray Chowdhury, T. K.; 'Land Control : class structure and class Relations in Western Duars, June, 1987 Page - 27

৪৯. মুখোপাধ্যায়, শিবশংকর; জলপাইগুড়ি জেলার সামাজিক কাঠামো, মধুপর্ণী, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা ১৯৮৭, পৃষ্ঠা - ১৫৩-১৫৪, ঐ, কোচবিহার জেলার সামাজিক কাঠামো, মধুপর্ণী, কোচবিহার জেলা সংখ্যা, ১৯৯০ পৃষ্ঠা - ১১০

৫০. অধিকারী, মাধব চন্দ্র; রাজবংশী সমাজ ও মনীষী পঞ্চানন বর্মা, ১ম খণ্ড, রিডার্স সার্ভিস, কল - ৭৫, ২০১৪, পৃষ্ঠা - ৫২

৫১. এম, কাব্যভূষণ; রাজবংশী ক্ষত্রিয় দীপক, দিনাজপুর, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৪৮-৪৯